।। ইতি গজ ।।

মহাপ্রস্থান

রজত শুভ্র কর্মকার

বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন

ভূ মি কা

‘ইতি গজ’-র প্রথম খণ্ড যখন লিখেছিলাম তখন আমার মাথায় এই প্রশ্নটি ছিল যে, অমরত্ব আশীর্বাদ না অভিশাপ? প্রশ্নটি যেমন সহজ, উত্তরটিও জানা। অবশ্যই এটি অভিশাপ। একজন মানুষ, সে বেঁচে থাকতে বাধ্য, কারণ সে অমরত্বের অভিশাপে অভিশপ্ত; মৃত্যু তার কাছে একটা পালাবার পথ হতে পারে, কিন্তু জীবন নামক জেলখানা তাকে পালাতে দিচ্ছে না। প্রথম পর্ব যারা পড়েছেন, তাঁরা জানেন সেই চরিত্রের কী হয়েছিল গল্পের শেষে। তারপর কেটে গেছে অনেক ক’টা দিন। আগের খণ্ডের কেন্দ্রে যিনি ছিলেন, তিনি এই দ্বিতীয় খণ্ডেও চেষ্টা করছেন সেই অমরত্বের অভিশাপ ভেঙে বেরনোর। আর এ-জন্য তিনি পরবর্তী আধার হিসেবে খুঁজে বার করেছেন এমন একজনকে, যাকে একমাত্র রবীন্দ্রসংগীতই শান্ত রাখতে পারে! আর সেই অভিশপ্ত মহাকাব্যিক চরিত্রটিকে পুনরায় আটকানোর গুরুদায়িত্ব নিয়েছেন সেই ডক্টর বোধিসত্ত্ব নাগ। কিন্তু তাঁর হাতে সময় বেশি নেই, কারণ তাঁর শরীর একটু-একটু করে ক্ষয়ে যাচ্ছে। আর তিনি ভাবছেন এই পৃথিবীকে বাঁচানোর গুরুদায়িত্ব তাঁর একারই। তাঁর এই ভাবনা কতটা ঠিক বা ভুল? এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে এই উপন্যাসে। আর এটা তো সত্যি কথা, লেখার সময় এই উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি আমি ঠিক করতে পারিনি। আমি ভেবেছিলাম এক, কিন্তু লেখার সময় দেখলাম চরিত্ররা নিজেরাই নিজেদের পথ ঠিক করে নিল। আর কী! আমি দর্শকের ভূমিকা পালন করলুম মাত্র। আর যা আমি দেখতে পেয়েছি সেটাই আমি দেখানোর চেষ্টা করছি এখানে।

উপন্যাসটিকে লেখার জন্য আমি বিশেষ ধন্যবাদ দেব আমাদের বসম্যান-কে যাকে আজকাল আমি অনেক নামে ডাকি, নীল ব্রোস্কি থেকে শুরু করে বিগ লেবোউস্কি এরকম অনেক কিছু। কারণ ‘ইতি গজ’-কে সিরিজে পরিবর্তিত করার ভাবনাটা তারই ছিল। আর আমাদের বসম্যান যে এই বইটিকে বের করার দুঃসাহস দেখিয়েছে সেটার জন্য একটা বিশেষ ধন্যবাদ তার প্রাপ্য। বিশেষ ধন্যবাদ অবশ্যই প্রাপ্য আমার বন্ধু ডক্টর রেনি অজয়ের, যার কাছ থেকে আমি মনস্তত্ত্ব সংক্রান্ত পরামর্শ পেয়েছি। আর হ্যাঁ, আবারও বলি, এটি সম্পূর্ণভাবে একটি ফ্যান্টাসি উপন্যাস, কোনো ঘটনা বা চরিত্রের সঙ্গে মিল পেলে সেটা নিছকই কাকতালীয় এবং অনিচ্ছাকৃত। এখানে বর্ণিত সকল ঘটনাবলিকে পরিণতমনস্ক পাঠকেরা গল্প হিসেবেই গ্রহণ করবেন, এই আশা রাখব। ব্যস, এটুকুই বলা।

০

জানুয়ারি ২৬
রাত দশটা

আমি জানি না কতদিন পারব নিজেকে স্থির রাখতে। আমি জানি না। আমাকে সে বলে, প্রলয় আনতে হবে। নতুবা এই পৃথিবী নিষ্কলুষ হবে না। আমি জানি, এই পৃথিবী কতটা আবর্জনায় ভরে গিয়েছে। আমি জানি, এই পৃথিবীর অধিপতি মানুষেরা আর আগের মতো নেই। তাদের আত্মায় ধরেছে পচন। তারা বিষিয়ে তুলছে এই পৃথিবীকে, আর তাদেরকে ঝাড়ে-বংশে শেষ না করতে পারলে এই পৃথিবীর উদ্ধার সম্ভব নয়। নয়। কোনোভাবেই নয়।

একটা রুলটানা খাতায় এই কথাগুলো লিখছিল সে। না লিখতে পারলে তার মন শান্ত হচ্ছিল না মোটেও। খাতার মধ্যে এই টুকরো কথাগুলো লিখেই সে নিজেকে শান্ত রাখতে পারে, মনে হয় সে যেন ঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ওর খুব কাছের এক মানুষ, ওর সহযোদ্ধা যে পথে এগিয়ে গিয়েছিল, সেই পথেই সে এগোচ্ছে। ও জানে, এই পথ ছাড়া ওর গতি নেই। প্রলয় ছাড়া গতি নেই। নাহলে এই অভিশপ্ত জীবন থেকে ওর মুক্তি নেই।

"তৃতীয় পাণ্ডব! শুনতে পাচ্ছ, তৃতীয় পাণ্ডব?" ওই যে ডাক দিয়েছে ও। মনের ভেতর-ঘর থেকে ডাক এসেছে। দীর্ঘদেহী মানুষটি উত্তর দিল, "পাচ্ছি।"

"প্রলয় আসতে বেশি দেরি নেই। চিন্তা কোরো না। আর কয়েক মাস। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি আমাকে পৌঁছে দেবে আমার আদর্শ আধারের কাছে। যার ক্ষমতার কাছে ওই প্রবুদ্ধ মানবও তুচ্ছ!"

"ততদিন আমি যদি বেঁচে না থাকি? যদি এই শরীর সাড়া দেওয়া বন্ধ করে দেয়?"

"চিন্তা কোরো না, উপায় বেরোবেই। যদি তোমার শরীর তার শেষ সীমানায় পৌঁছে যায় তাহলে তুমি এমন কাউকে আমার অস্থায়ী আধার হিসেবে বেছে নিয়ো, যে আমাকে আমার আদর্শ আধারের কাছে পৌঁছে দেবে।"

সেই দীর্ঘদেহী বসে রইল চুপ করে কিছুক্ষণ, টেবিলের সামনে রাখা তিন-চারটে কাগজের ওপর সে চোখ বোলাল, তারপর একটা ছবির ওপর আঙুল রেখে বলল সে, "অস্থায়ী আধার হিসেবে এই ব্যক্তি কাজ করতে পারে বলে মনে হয়।"

"সহমত আমিও। কিন্তু মনে রেখো, আদর্শ আধারের কাছে যাওয়ার অন্তত পক্ষে একদণ্ড আগে সেই অস্থায়ী আধারে স্থানান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। নইলে সমস্যা হবে।"

"চিন্তা নেই। তাই-ই হবে।"

"তবে তার আগে আমাদের পথের কাঁটাকে সরাতে হবে। বুঝতে পেরেছ তো?"

"হয়ে যাবে। একটু-একটু করে তাকে পথ থেকে সরানোর সব ব্যবস্থা আমি করে নেব।" বলে সে আরও একটা ছবি তার সামনে বের করল।

ওর ভেতর-ঘরের অতিথি জিজ্ঞেস করল, "এই মহিলা পারবে বলে মনে হয়?"

"আপনার খণ্ডাংশের দ্বারা সংক্রামিত এ। প্রতিনিয়ত তার জোগান না পেলে এ পাগল হয়ে যাবে। আমি যা বলব, এই মহিলা তা-ই করতে বাধ্য!"

"বেশ, যা বললে আমি বিশ্বাস করলাম। তোমার এই সিদ্ধান্তের প্রতি আমার ভরসা তৈরি হয়েছে।"

মাথা নীচু করে যেন অভিবাদন জানাল সেই দীর্ঘদেহী, "ধন্যবাদ আপনাকে।"

"তুমি অনেক বার ওই ব্যক্তির পিছু নিয়েছিলে, কিন্তু সে প্রতিবার পালিয়ে বেঁচেছে। আশা করা যায় এবার সে পালাতে পারবে না।"

"যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন।"

"আর আমার অর্ধাংশ?"

"তাকেও আমি আপনার কাছে আনার ব্যবস্থা করব। সব ঠিক থাকলে আমাদের পথের কাঁটাকে আগে উপড়ে ফেলা হবে। তারপর আপনার অর্ধাংশকে আপনার কাছে আনা হবে।"

"তা-ই হোক। সমস্যা নেই কোনো। আমার অর্ধাংশকে না পেলেও ক্ষতি নেই। আমাকে শুধু আমার আদর্শ আধারের কাছে পৌঁছতে হবে।"

"হয়ে যাবে। আপনি চিন্তা করবেন না। আপনি চিন্তা করবেন না।"

"চিন্তা করি না, হে বালক। চিন্তার অনেক ঊর্ধ্বে আমি বিরাজ করি। বিশ্রাম নাও এখন। রুদ্র যে কাজ সম্পন্ন করতে পারেনি, সেই কাজ তোমাকে সম্পন্ন করতে হবে। আর আমি জানি তুমি পারবে, কারণ তুমি আদেশ পালন করতে জানো।"

হ্যাঁ, আদেশ পালন করতে জানে অর্জুন। এটাই সে করে এসেছে। রুদ্রর মতো নয় সে।

১

অগাস্ট ২৬
ভোর পাঁচটা

প্রতিদিন ভোরের আলো না ফোটার আগেই ঘুম থেকে উঠে হাঁটতে বেরনো অভ্যাস ইসমাইল মাস্টারের। পেশায় দরজি ইসমাইল এই কোচি শহরে রয়েছে প্রায় কুড়ি বছরেরও ওপর। শহরটাকে বেশ ভালোবেসে ফেলেছে সে। এখানেই বিয়ে-থা করে সংসার পেতেছে। দিব্যি আছে। মুর্শিদাবাদ থেকে এখানে এসেছিল ভাগ্যান্বেষণের জন্য। আর ভাগ্য তাকে যা দিয়েছে তাতে ইসমাইলের কোনো আক্ষেপ নেই। শানদার টেইলার্সের মালিক ও এখন। এই কোচি শহরের অন্যতম নামকরা দরজির দোকান হল এই শানদার টেইলার্স। ওর কাছে শহরের সবচেয়ে বড়ো-বড়ো রাজনেতা থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরা আসে জামা-প্যান্ট-স্যুট বানানোর জন্য। ব্যস, আর কী চাই! যা যা দরকার ছিল সবই আছে ওর। আর শুধু তা-ই'ই নয়, জামাকাপড়ের মাপ নেওয়ার সময় ইসমাইল এমন-এমন অনেক খবর জানতে পারে এই সব গুরুত্বপূর্ণ লোকেদের যা এদেরকে বেকায়দায় ফেলতে পারে। কী করবে ইসমাইল এই খবরগুলোর? কী আর করবে ও, নিজের কাছে সাংকেতিক ভাষায় লিখে রেখে দেবে। আর প্রতি সপ্তাহে একটা ঠিকানায় সেই লেখাগুলোকে ক্যুরিয়ার করে দেবে। বিনিময়ে প্রতি মাসে ওর কাছে একটা করে প্যাকেট চলে আসবে, যার মধ্যে থাকবে টাকার একটা মোটা বান্ডিল। আর সেটা আসবে এই মর্নিংওয়াক করার সময়ই। কোচি শহরের মেরিন ড্রাইভ ওয়াকওয়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেখানে একজন হকার থাকবে, চা নিয়ে বসে থাকবে সে। তার কাছ থেকেই একটা প্লাস্টিকে মোড়ানো প্যাকেট নিয়ে সে এগিয়ে যাবে তার বাড়ির উদ্দেশে।

আজ বেরনোর সময়ও সেটাই ভাবল ইসমাইল। দেখা যাক চা-ওয়ালা সময়মতো আসে কি না। মেরিন ড্রাইভ ওয়াকওয়ে থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে ওর বাড়ি। সেখান থেকে হাঁটতে-হাঁটতেই চলে আসে ও। আজও তা-ই করবে। ভোরের আলো না ফোটার আগেই সে জামা-জুতো-ট্র্যাকস্যুট পরে সে

তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল। ভোরবেলার আবহাওয়া বেশ মনোরম। পলিউশন কম থাকে, যানবাহন থাকে না বললেই চলে, আর কপাল ভালো থাকলে মাঝে মাঝে টাইট্‌স পরিহিতা বেশ কয়েক জন নাগরিকাদেরও দেখা পাওয়া যায়। আজকাল বিবির থেকে সেভাবে কিছু মেলে না, তাই দেখেই শান্তি করে নেয় ইসমাইল। কী আর করা যাবে। হাঁটছিল বেশ জোরেই। এমন সময় পাশ থেকে এক সুমধুর কণ্ঠে কেউ বলল, "হাই!"

পাশে যে জন রয়েছে, তাকে দেখে ইসমাইলের রক্ত চলাচল তীব্র হয়ে গেল রীতিমতো। হবে না-ই বা কেন? এরকম ঠাসা বুক আর নিতম্ব দেখলে যে কারওর মাথা খারাপ হয়ে যাবে। একটা মেরুন রঙের টাইট প্যান্ট আর নীল রঙের টপ পরে ওর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে এক মহিলা। সেই মহিলার দিকে ইসমাইল ওর উঁচু দাঁতগুলো বের করে হাসল, "হাই!"

"আপনি তো মেরিন ড্রাইভ ওয়াকওয়ের দিকে যাচ্ছেন, তা-ই না?" মহিলা বলে উঠল।

"হ্যাঁ।" মাথা নাড়ল ইসমাইল। ও দেখে যাচ্ছে সেই মহিলাকে। উফ্! সত্যিই আগুন চেহারা পুরো! আর বয়সও খুব বেশি না, মেরেকেটে ত্রিশের কাছেই হবে হয়তো। মহিলা বলছে তখন, "আমি শবনম। মেরিন ড্রাইভ ওয়াকওয়ের দিকেই যাচ্ছি। কিন্তু রাস্তাটা গুলিয়ে যাচ্ছে একটু। আপনি হেল্প করবেন, প্লিজ?"

শবনম! উফ্, কী নাম! ইসমাইল মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, মানে... ইয়ে... মানে, করব তো! যেখানে-যেখানে বলবেন সেখানেই নিয়ে যাব। আপনি শুধু আমাকে ফলো করুন। দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।"

শবনম ইসমাইলের কাঁধে হাত রেখে বলল, "আরে, থ্যাঙ্ক ইউ। আপনি বহুত সুইট, জানেন তো? এরকমভাবে হেল্প কে করে বলুন আজকের দিনে! সত্যিই আপনি না থাকলে— "

ইসমাইল গলে যাচ্ছে রীতিমতো, ওর কাঁধে যে একটা পিন ফোটার মতো অনুভূতি হয়েছে সেটাকে ও পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে ও বলছে, "আরে ম্যাডাম, হেল্প কি, আমি আপনাকে জন্নতেরও সফর করাতে পারি! যদি আপনি রাজি থাকেন! বুঝলেন? চলুন।" পুলক ধরছে না আর ইসমাইলের মনে, এতদিনে বোধ হয় বিবিকে বাদ দিয়েও একজন বাহারওয়ালি পাওয়া গেল যার কাছে এই ধরনের চাওয়া-পাওয়াগুলো মিটবে।

ইসমাইল সেদিন অবশ্য মেরিন ড্রাইভ ওয়াকওয়েতে আর পৌঁছতে পারেনি। ওর নিথর শরীর পাওয়া যায় শহরের ফুটপাথে। পোস্টমর্টেম করলে জানা যাবে হঠাৎ হৃৎযন্ত্র কাজ করা বন্ধ করাতে এই অবস্থা হয়েছে। বিষক্রিয়ার ফলাফল নাকি? বলা যাবে না। আর সেই শবনম নামের মহিলা? ওই মহিলাকে এরপর

আর কোচি শহরে দেখা যায়নি। যে ঠিকানায় ওই ক্যুরিয়ারগুলো যেত, সেখানে এই ক্যুরিয়ারগুলো যাওয়া এখন বন্ধ হয়ে যাবে। খবর পৌঁছবে না আর।

***

সেপ্টেম্বর ২৩
রাত এগারোটা

'এক বাঁচে সাবধান, আর এক বাঁচে বুদ্ধিমান!'

ছোটোবেলায় এই কথাটা অনেক শুনেছে ম্যানি। তার বাপ-ঠাকুরদা সবাই বলতেন এটা। কেন বলতেন তারা? ম্যানি কি একেবারেই বোকা? না, মোটেই তা নয়। সে ভীষণই বুদ্ধিমান একজন। নয়তো গোয়ার পালোলেম সমুদ্র-সৈকতের ধারে একটা ফুড-স্টল দিয়ে নিজেকে চালাতে পারত না। ব্যবসায়িক বুদ্ধি ভালোমতোই আছে তার। তাই তো এখনও সে দিব্যি বেঁচেবর্তে রয়েছে এবং কিছু একটা করেও খাচ্ছে। তাহলে এই কথাটা আসছে কেন? কারণ ম্যানি বড়োই অসাবধানী। মাঝে-মাঝেই নেশার ঘোরে ও বেফাঁস কথা বলে ফেলে। এই যেমন কয়েক দিন আগে ও একটা পাবে নেশার ঘোরে বলে ফেলেছিল যে, ও আগে এক আন্ডারওয়ার্ল্ড গ্যাং-এর হয়ে কাজ করত, ও নাকি সেই গ্যাং-এর টপ শ্যুটার ছিল! সবাই ভেবেছিল, এহ্, মাতাল হয়ে ভুলভাল বকছে এই পাবলিক, কে এর কথাকে সিরিয়াসলি নেবে? কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে, ম্যানি যা বলে তা ভুল নয় মোটেও। প্রায় একযুগ আগে ও মুম্বাই আন্ডারওয়ার্ল্ডে পরিচিত ছিল কুখ্যাত শ্যুটার মনোহর রাও নামে। যে-সময় মুম্বাই-এর রাস্তায় গ্যাংগুলো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, আর তাদের সঙ্গে প্রায়ই পুলিশের এনকাউন্টার স্পেশালিস্টদের খণ্ডযুদ্ধ চলছে, তখন ম্যানি ওরফে মনোহরের শিকার হয়েছে অসংখ্য বিরোধী গ্যাং-এর সদস্য এবং কিছু পুলিশও। কিন্তু একদিন ম্যানি হঠাৎ ধরা পড়ে পুলিশের হাতে। ওর মনে হয়েছিল যে সেদিনই হয়তো ওর শেষ দিন, হয়তো সেদিনই ওকে কেউ পরপারে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু না, ম্যানি বেঁচে তো রয়েছে! কারণ ও একজনের সঙ্গে চুক্তি করেছিল। ও মুম্বাইয়ের কুখ্যাত এক গ্যাং-এর লুকোনো ডেরার ঠিকানা দেবে পুলিশকে, আর তার বিনিময়ে ম্যানি বেঁচে থাকতে পারবে। তফাৎ শুধু একটাই, খাতায়-কলমে ওর মৃত্যু হবে এবং ওকে সারা জীবনের মতো মুম্বাই ছেড়ে চলে যেতে হবে। রাজি হয়ে গিয়েছিল ম্যানি। রাজি না হয়ে উপায়ও ছিল না। কারণ, যে লোকটার সঙ্গে ও চুক্তিটা করেছিল, সে এই দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত, আর তলে-তলে ম্যানি শুনেছিল সেই লোক নাকি শয়তানের সঙ্গেও দিব্যি চুক্তি করে বেরিয়ে চলে আসবে। এরপর ভুয়ো এনকাউন্টারের একটা